সব মরণ নয় সমান : ভাঙড়ের চলমান আন্দোলনে একটি দৃষ্টিপাত

ঈশান

গত ডিসেম্বরে কলকাতার নিকটবর্তী এলাকা ভাঙড়ের প্রায় ৩০ হাজার গ্রামবাসী শহরে বিক্ষোভে জমায়েত হন। ২০১৩ সালে জনগণের কাছে তথ্য গোপন করে 'উন্নয়ন' নামের এক প্রকল্প কাজ শুরু হয় ভাঙড়ে। তারপর থেকে যতো বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে ততো জমি ও বাস্তুসংস্থান রক্ষার লড়াই সংগঠিত হয়েছে। এক পর্যায়ে তার ঢেউ কলকাতা শহর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পাশাপাশি পুলিশ ও সরকারি দলের সন্ত্রাসী বাহিনীর আক্রমণ, নির্যাতন, প্রতারণা চলতে থাকে একের পর এক। এরই এক পর্যায়ে পুলিশের গুলিতে দুজন নিহত হন। আন্দোলন এতে থামেনি বরং আরও বিস্তৃত হয়। এই লেখায় সেই কাহিনী আর তার প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সব মরণ সমান হয় না। হতে পারে না কখনো। তাই সব মরণের অভিঘাতও হয় আলাদা আলাদা। বাঁশখালীতে কাদায় লেপ্টে থাকা লুঙ্গি পরা কালো কালো চামড়ার ওই লাশগুলো যাদের, তাদের মরণ হিমালয়ের চেয়েও ভারী ছিল। ভাঙড়ে রাষ্ট্রের গুলিতে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাওয়া আলমগীরের নিষ্প্রাণ চোখ দুটোর ওজন বুঝি কম কিছু? আমরা যারা এত কিছুর পরও বেঁচে থাকি, তাদের থাকে ফুল গেঁথে গেঁথে যুক্তির মালা বানানোর সুবর্ণ সুযোগ। ঝরে যাওয়া মফিজুল-আলমগীররা যদি ফুল হন, তাহলে সেই ফুলের মালাই হলো 'উন্নয়ন'।

'উন্নয়ন'–এই আপাত নিরীহ শব্দটি রাষ্ট্র-পুঁজি আঁতাতের কাছে আসলে যে কত বড় কামান, তা বোধ হয় বাঁশখালী, রামপাল, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম ভালোমতোই টের পেয়ে আসছে। এই নরম মাখনের মতো শব্দটির আড়ালে রাষ্ট্রক্ষমতা তার হিংস্রতাকে পুষে চলে অবিরাম। তার ঝাপটা আজ না হয় কাল, সাধারণের ওপরে এসে পড়েই... কলকাতার ভাঙড়ে পড়ল যেমন এ বছরের জানুয়ারি মাসের ১৭ তারিখে।

'উন্নয়ন'–এই আপাত নিরীহ শব্দটি রাষ্ট্র-পুঁজি আঁতাতের কাছে আসলে যে কত বড় কামান, তা বোধ হয় বাঁশখালী, রামপাল, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম ভালোমতোই টের পেয়ে আসছে। এই নরম মাখনের মতো শব্দটির আড়ালে রাষ্ট্রক্ষমতা তার হিংস্রতাকে পুষে চলে অবিরাম।

২০১৩ সালের শেষ দিকে (নভেম্বর-ডিসেম্বর) রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড (PGCIL) পশ্চিমবঙ্গের রাজারহাট এলাকায় একটি পাওয়ার সাবস্টেশন বসানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এটি আদতে একটি ৪৪০/২২০ কিলোভোল্ট মাপের পাওয়ার গ্রিড। বাংলাদেশে সুন্দরবন রায় রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলনের কারণে পরিচিত কুখ্যাত ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন (NTPC) ফারাক্কা ও কাহালগাঁও বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎকে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মধ্যে আদান-প্রদানের জন্য এটি বানানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। এখন জানা যাচ্ছে যে এখান থেকে বাংলাদেশেও বিদ্যুৎ আসবে। এই পাওয়ার গ্রিডের পরিকল্পনার মধ্যেই পড়েছে প্রায় ৯৫৩ কিলোমিটার বিদ্যুৎ সঞ্চালনকারী লাইন, যার মধ্যে ৪৮০ কিলোমিটার পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে যাবে, প্রায় সাতটি জেলাকে ছুঁয়ে। আর এই বিদ্যুতের লাইন দিয়ে যাবে ৪৫০ মেগাওয়াট মতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ, যা বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার কথা। কিন্তু সমস্যা তাহলে কোথায়? আসা যাক সেই প্রসঙ্গে।

একটি পাওয়ার গ্রিড লোকালয়ে স্থাপিত হলে তার কিছু সরাসরি খারাপ প্রভাব পড়ে জনজীবনের ওপর। আর দক্ষিণ চব্বিশপরগনা জেলার কাশীপুর থানার অন্তর্গত পোলেরহাট-২ পঞ্চায়েতের যে খামারাইট গ্রামের পাশে এই গ্রিড বসার কথা, তার থেকে জনবসতি মাত্র ১০০ ফুট দূরে অবস্থিত। সেই খারাপ প্রভাবগুলোর মধ্যে প্রথম হলো ইন্স্যুলেটর বা বিদ্যুৎ-নিবারক হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া সালফার হেক্সাফ্লুওরাইড (SF_6) নামক একটি প্রায় নিষ্ক্রিয় গ্যাস। বিভিন্ন গবেষণায় এটি প্রকাশিত যে SF6 কার্বন ডাই-অক্সাইডের চেয়ে প্রায় ২৩ হাজার ৯০০ গুণ বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস দূষণ ঘটাতে সক্ষম।[১] এটা সেভাবে বিষাক্ত গ্যাস না হলেও মানুষের ফুসফুসে ঢুকে গিয়ে সেখানে অক্সিজেনের চলাচল কমিয়ে দিতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত ও পরিপাকক্রিয়ার নানা রোগ ডেকে আনতে পারে। আর এই গ্যাসের আণবিক ওজন তুলনামূলক বেশি, অর্থাৎ এটি একটি ভারী গ্যাস। তাই মাটির কাছাকাছি এই গ্যাস রয়ে যায় এবং প্রকৃতিতে ৮০০ থেকে ৩২০০ বছর অবিকৃত অবস্থায় থেকে যেতে পারে।[১] ফলে তা শুধু মানুষ নয়, স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রেরও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি সাধন করতে পারে। আর এই রকমের পাওয়ার গ্রিড থেকে SF6 লিক করা পুরোপুরি আটকানো কখনোই সম্ভব নয়। আমেরিকার অতি উন্নত প্রিন্সটন প্লাজমা ফিজিকস ল্যাবরেটরিতে প্লাজমা তৈরির সময় প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি করতে হয়, সূর্যের কেন্দ্রের চেয়েও সেই তাপমাত্রা অনেক গুণ বেশি। সেটির জন্য প্রচুর ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ লাগে, আর ফলত বিদ্যুৎ-নিবারক হিসেবে এই SF6 ও লাগে। তাদের অত উন্নত প্রযুক্তির পরও কিন্তু সেখান থেকে বছরে প্রায় ৩২ হাজার পাউন্ড ওজনের SF6 লিক করে বের হয়ে যায়।[২] তার মানে বোঝা যাচ্ছে, পাওয়ার গ্রিড হলে এই গ্যাসটি অবশ্যই নির্গত হবে এবং ক্ষতি সাধন করবে। দ্বিতীয়ত, এই রকমের হাই ভোল্টেজ লাইন থেকে সব সময়ই কিন্তু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ বের হতে থাকে। তারের ঠিক নিচে এর প্রভাব সর্বোচ্চ, আর তার থেকে দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে এই প্রভাব কমে। কিন্তু এই পাওয়ার গ্রিডটির ক্ষেত্রে যত ক্ষমতার বিদ্যুৎ বহনকারী তার ব্যবহৃত হতে চলেছে, সেটির জন্য ৩০০ মিটার দূরবর্তী এলাকার মধ্যে অবস্থিত সমস্ত প্রাণ-প্রকৃতির ওপরই এর প্রভাব পৌছবে। আর প্রস্তাবিত এই গ্রিড থেকে মাত্র ১০০ ফুট দূরেই জনবসতি রয়েছে এবং অবশ্যই কৃষিজমি হওয়ার কারণে এটির আশপাশে কৃষকদের নিয়মিতই যেতে হবে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা অনেকে জানিয়েছে যে ওই তারের নিচে কেউ ইলেকট্রিক টেস্টার নিয়ে গেলে তা আপনা-আপনিই জ্বলে ওঠে (পাওয়ার গ্রিড থেকে বের হওয়া মূল দুটি লাইনের মধ্যে একটি লাইনের কিছু অংশে বিদ্যুৎ সঞ্চালন শুরু হয়েছে, খামারাইট ও মাছিভাঙা গ্রামের পাশে। এই বক্তব্য ওই দুটি গ্রামের মানুষেরই)। এর থেকে আন্দাজ করা

যায় সেখানে কতটা তড়িৎ-চুম্বকীয় প্রভাব রয়েছে। আধুনিক নানা গবেষণা থেকে আমরা জানতে পেরেছি, এই তরঙ্গ মানবশরীরের এবং প্রভাবাধীন এলাকার বাস্তুতন্ত্রের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। কৃষিজমির ওপর স্থাপিত হলে ফসলের ফলনের ওপর প্রভাব ফেলে। আবার যে অঞ্চলে মাছের খামার সেখানেও ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। বিশেষত গর্ভবতী মা ও শিশুর শরীরে নানা সমস্যা ডেকে আনাও অস্বাভাবিক নয়।[৩]

এ তো গেল একটি পাওয়ার গ্রিড স্থাপিত হলে তার পরিবেশ-বাস্তুতন্ত্র-জীবিকাগত ক্ষতিকর প্রভাব। এবার আসা যাক রাষ্ট্র-পুঁজি-মানুষ-জীবন-রাজনীতির চক্করটিতে। তথ্যানুসন্ধানকারী বিজ্ঞানী, সমাজকর্মী, ডাক্তার, গবেষক, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের একটি দল যা রিপোর্ট দিচ্ছে, তা থেকে জানা যাচ্ছে, কেন্দ্র সরকারি এই প্রজেক্টের জন্য জমি অধিগ্রহণ করার সময় কোনো রকম গণশুনানি বা পরিবেশগত প্রভাবের সমীক্ষা (Environmental Impact Assessment, EIA) করাই হয়নি। বরং খামারাইট, টোনা, মাছিভাঙা, গাজীপুর প্রভৃতি গ্রাম থেকে জোর করে প্রায় ১৬ একর জমি নেয়া হয়েছিল। এবং এই কাজে প্রশাসন ও স্থানীয় কাশীপুর থানাকে গায়ের জোরে সাহায্য করেছিল পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূলের আশ্রিত গুণ্ডা-নেতা আরাবুল ইসলাম ও তার বাহিনী। নানাভাবে ভয় দেখিয়ে, পরিবারের সদস্যদের যথেচ্ছভাবে থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে, হত্যার হুমকি দিয়ে অত্যন্ত কম দামে এই প্রায় ৫০ বিঘা জমি তাদের থেকে (অন্তত ৩০টি পরিবারের) নিয়ে নেয়া হয়। আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে অজ্ঞ গ্রামের মানুষরা এত কিছুর পরও তেতো গেলার মতো মেনে নিয়েছিল অত্যাচার। তারা ভেবেছিল, এখানে ছোটখাটো পাওয়ার হাউস হবে, তারা আরো ভালো বিদ্যুৎ পরিষেবা পাবে।

ওখানে কনস্ট্রাকশনের ঠিকাদারি পাওয়া সিমেন্স কোম্পানির কর্মচারীদের থেকে তারা বারবার জানতে চায় এখানে কী হতে চলেছে। কোনো সদুত্তর তারা পায় না, চরম বিভ্রান্তির মধ্যে তারা দিন কাটাতে থাকে। এরপর ক্রমশ শুধু খামারাইট নয়, আশপাশের গ্রামেও এ রকম জোর করে বহুফসলি, অত্যন্ত উর্বর জমি নেয়া শুরু হয়ে যায়।

তত দিনে চলে এসেছে বিধানসভা নির্বাচন। তৃণমূল দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জিতে ফের মসনদে বসল। তার পরই আসল খেল শুরু হলো। গ্রামবাসী দেখল, বিশাল বিশাল যন্ত্রপাতি, কাঠামো ইত্যাদি আনা হচ্ছে ওই অধিগৃহীত ও পাঁচিল তুলে দেয়া জমির মধ্যে। এখানে কোনো সাধারণ পাওয়ার হাউস নয়, বরং অত্যন্ত উচ্চক্ষমতার বিদ্যুৎ বহনকারী ও সরবরাহকারী পাওয়ার গ্রিড বসবে, তা ক্রমশ তাদের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। ওখানে কনস্ট্রাকশনের ঠিকাদারি পাওয়া সিমেন্স কোম্পানির কর্মচারীদের থেকে তারা বারবার জানতে চায় এখানে কী হতে চলেছে। কোনো সদুত্তর তারা পায় না, চরম বিভ্রান্তির মধ্যে তারা দিন কাটাতে থাকে। এরপর ক্রমশ শুধু 'খামারাইট' নয়, আশপাশের গ্রামেও এ রকম জোর করে বহুফসলি, অত্যন্ত উর্বর জমি নেয়া শুরু হয়ে যায়। মানুষের বিভ্রান্তি কাটতে থাকে, কেন্দ্র আর রাজ্য সরকারের যুগ্ম এই কার্যকলাপ যে আসলে সব দিক থেকেই তাদের স্বার্থবিরোধী, এটা তারা বুঝে ফেলে। পাশাপাশি অনেকগুলো গ্রামের মানুষ এবার কাছাকাছি আসে, জোটবদ্ধ হয় এবং আন্দোলন সংগঠিত করতে গঠন করে 'জমি জীবিকা বাস্তুতন্ত্র পরিবেশ রক্ষা কমিটি'। মানুষের নিজের পায়ে দাঁড়ানো গণ-আন্দোলনে ভরসা রাখা ছাত্রছাত্রীরা এই আন্দোলনের সমর্থনে আসে। নানা স্তরের সমাজসচেতন মানুষ আসে। তবে মূল স্রোতের পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় আছে এমন বা যেতে ইচ্ছুক এমন কোনো রাজনৈতিক দল, সংগঠন বা সংস্থাকে তারা খুব সচেতনভাবে আলাদা করে রেখেছে তাদের এই আন্দোলন থেকে। মূল কারণ বোধ হয় ভারতের বুকে এ রকম একাধিক আন্দোলনের ব্যর্থতা, যেখানে আন্দোলনের রাশ কোনো না কোনো পর্যায়ে চলে গেছে মূলধারার রাজনৈতিক দলের পকেটে। ফলত মানুষ তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এমনটা করেছে। যা হোক, শুধু খামারাইট নয়, এরপর একাধিক গ্রাম এতে শামিল হলো। শ্যামনগর, স্বরূপনগর, দেগঙ্গা, পদ্মপুকুর ইত্যাদি। কারণ এই সব গ্রামের ওপর দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল ওই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতের তার। জমি জীবিকা বাস্তুতন্ত্র পরিবেশ রক্ষা কমিটির তরফ থেকে তারা জেলা শাসক ও সংশ্লিষ্ট সমস্ত দপ্তরে চিঠি দেয় এই গ্রিডের বিরোধিতায়। তাদের ওপর অত্যাচার বাড়তে থাকে। বিপরীতে গ্রামবাসীও জোটবদ্ধ হতে শুরু করে। একসময় প্রায় ৩০ হাজার মানুষ বিভিন্ন গ্রাম থেকে এসে দাঁড়ায় কমিটির মধ্যে। চলে প্রতিবাদ সমাবেশ, রাস্তা অবরোধ। নভেম্বরে এই আন্দোলন চরম আকার নেয় পাওয়ার গ্রিডে বিদ্যুতের খুঁটি পোঁতাকে কেন্দ্র করে। প্রায় ১০ হাজার মানুষ গ্রিডের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে অনেককে। মারধর করে, লাঠিচার্জ করে জনতাকে তাড়িয়ে দেয়। জারি হয় ১৪৪ ধারা। পাশাপাশি অঞ্চলের তৃণমূল বিধায়ক রেজ্জাক মোল্লা এবং আরাবুল ও সব্যসাচী দত্তের দলবল নিয়ে এসে শাসানি চলতে থাকে। পাওয়ার গ্রিডের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইফেক্ট নিয়ে চিন্তিত মায়েদের উদ্দেশে এক সভায় অত্যন্ত কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ শানান রেজ্জাক মোল্লা। বলেন, "কে এত বলছে? কার বাচ্চা বন্ধ হয়ে গেছে? আর যদি বাচ্চা বন্ধ হয়েই যায়, তাহলে আমি একটা বাচ্চা কিনে দেব। হাইব্রিড বাচ্চা দিয়ে দেব।" এরপর ২২ ডিসেম্বর গ্রামবাসী প্রায় ৩০ হাজার জনের একটি মিছিল করে মূল কলকাতা শহরের বুকে, কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত, তাদের আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে দিতে। তারা রাজ্যপালের কাছে তাদের দাবিপত্র পেশ করে। গত এক দশকে তেমন মিছিল মহানগরী দেখেনি। এতে প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। ২৫ ডিসেম্বর তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের আলোচনা হয়। প্রচুর শাসক

বিপরীতে গ্রামবাসীও জোটবদ্ধ হতে শুরু করে। একসময় প্রায় ৩০ হাজার মানুষ বিভিন্ন গ্রাম থেকে এসে দাঁড়ায় কমিটির মধ্যে। চলে প্রতিবাদ সমাবেশ, রাস্তা অবরোধ। নভেম্বরে এই আন্দোলন চরম আকার নেয় পাওয়ার গ্রিডে বিদ্যুতের খুঁটি পোঁতাকে কেন্দ্র করে। প্রায় ১০ হাজার মানুষ গ্রিডের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে অনেককে। মারধর করে, লাঠিচার্জ করে জনতাকে তাড়িয়ে দেয়। জারি হয় ১৪৪ ধারা।

আশ্রিত গুণ্ডাবাহিনী এনে ঢোকানো হয় গ্রামে। মানুষ আরো ক্ষিপ্ত হতে থাকে, ২৮ তারিখ আবারও একটি জনসমাবেশের ডাক দেয়া হয়। সেটি আটকাতে প্রশাসন ফের জারি করে ১৪৪ ধারা। তা উপেক্ষা করেই মাছিভাঙায় আবারও কয়েক হাজার মানুষের সমাবেশ হয়। সেখানে দূর দূর গ্রামের মানুষও হাজারো রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, হেঁটে এসে উপস্থিত হয়। সাধারণ সভায় আন্দোলনের পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করে কমিটি। এর ঠিক পরপরই একদিন জমি জীবিকা বাস্তুতন্ত্র পরিবেশ রক্ষা কমিটির তরফ থেকে গ্রামবাসী এবং বাইরে থেকে আন্দোলনে সমর্থন জানানো মানুষ একটি প্রেস কনফারেন্স ও গণ-কনভেনশন করে কলকাতায়, যথাক্রমে ৫ ও ৭ জানুয়ারি। তৈরি হয় ভাঙড় আন্দোলনের সংহতি কমিটি। নতুন করে বিজ্ঞানীদের সাহায্য নিয়ে EIA করানোর প্রস্তাব আসে ওই কনভেনশনে। আদালতে মামলা করার ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেয়া হয়, যার কাজ এখন চলছে। শেষ পর্যন্ত এই বিপুল জনতার চাপে পড়ে বিদ্যুৎমন্ত্রী ঘোষণা করেন, অস্থায়ীভাবে এই গ্রিড স্থাপনের কাজ বন্ধ থাকবে, এবং গ্রামবাসীদের কমিটির সাথে জেলা শাসকের বৈঠকের ব্যবস্থা করা হবে, যাতে আলোচনার মাধ্যমে কোনো সমাধান সূত্র বের হয়।

কিন্তু ওপরে ওপরে এ রকম দুই পা পিছিয়ে এলেও ভেতরে ভেতরে অন্য কোনো পরিকল্পনা ছকতে থাকে শাসক। বিদ্যুৎমন্ত্রীর ঘোষণার পরপরই গ্রামে ও পাওয়ার গ্রিডের আশপাশে কোনো কারণ ছাড়াই গুণ্ডাবাহিনী ও পুলিশের আনাগোনা বেড়ে যায়। ধরপাকড় চলতে থাকে বিনা কারণে। ঘরে ঘরে ঢুকে ভাঙচুর চালানো হয়। অর্থাৎ নানাভাবে উসকানোর চেষ্টা চলতে থাকে গ্রামবাসীদের। কিন্তু স্বভাবশান্ত এই খেটে খাওয়া কৃষক মানুষরা সেই প্ররোচনায় পা দেয় না কিছুতেই। ১৬ জানুয়ারি পুলিশ হঠাৎই গ্রেপ্তার করে কালু শেখ নামের এক আন্দোলনকারীকে, যিনি আন্দোলনের অন্যতম মুখ। পাশাপাশি অনেককে জোর করে তুলে এনে পাওয়ার গ্রিডের নির্মীয়মাণ অংশে আটকেও রাখা হয়। পুলিশের এই ঘৃণ্য আচরণের কারণে সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ভাঙড়। মানুষ পুলিশকে আটকাতে বাধ্য হয়ে পাল্টা ইঁটপাটকেল ছোঁড়ার জায়গায় চলে যায়। তখন পুলিশ অথবা শাসকদলের গুণ্ডাবাহিনী গুলি ছোড়ে। গুলিবিদ্ধ হন সর্বমোট আটজন, প্রাণ হারান দুজন।

১৬ জানুয়ারি পুলিশ হঠাৎই গ্রেপ্তার করে কালু শেখ নামের এক আন্দোলনকারীকে, যিনি আন্দোলনের অন্যতম মুখ। পাশাপাশি অনেককে জোর করে তুলে এনে পাওয়ার গ্রিডের নির্মীয়মাণ অংশে আটকেও রাখা হয়। পুলিশের এই ঘৃণ্য আচরণের কারণে সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ভাঙড়। মানুষ পুলিশকে আটকাতে বাধ্য হয়ে পাল্টা ইঁটপাটকেল ছোড়ার জায়গায় চলে যায়। তখন পুলিশ অথবা শাসকদলের গুণ্ডাবাহিনী গুলি ছোড়ে। গুলিবিদ্ধ হন সর্বমোট আটজন, প্রাণ হারান দুজন।

এখন অগ্নিগর্ভ হয়ে আছে পরিস্থিতি। শাসকদল অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি তার এই জঘন্য ও মর্মান্তিক আচরণের সাফাই গাইতে নানা রকমের তত্ত্ব সাজাতে ব্যস্ত। সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও সমাজকর্মীরা, যাঁরা এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন, বৈজ্ঞানিক তথ্য সরবরাহ করে গ্রামবাসীদের আরো স্পষ্ট ভাষায় বিরোধিতার ইন্ধন দিয়েছেন সামান্য হলেও, এখন টার্গেট তাঁরা। তাঁদের নামে ভুয়া চার্জশিট আনার প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। মিডিয়াও পায়ে পা মিলিয়ে সেই চক্রান্তে শামিল। তারা রাষ্ট্র-পুঁজির সবচেয়ে প্রিয় উন্নয়নের যুক্তিটিকে মাখন লাগিয়ে পরিবেশন করছে জনমানসে। যেনবা ভাঙড়ের মানুষ উন্নয়ন চায় না!

২২ ডিসেম্বর গ্রামবাসী প্রায় ৩০ হাজার জনের একটি মিছিল করে মূল কলকাতা শহরের বুকে, কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত, তাদের আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে দিতে। তারা রাজ্যপালের কাছে তাদের দাবিপত্র পেশ করে। গত এক দশকে তেমন মিছিল মহানগরী দেখেনি।

এখানে আরেকটি প্রসঙ্গ খুবই উল্লেখযোগ্য। পাওয়ার গ্রিডটির জন্য যতজনের জমি অধিগৃহীত হয়েছে, তার সাথে আন্দোলনে অংশ নেয়া মানুষের সংখ্যার আকাশ-পাতাল তফাত। মাত্র ৩০টি পরিবারের জমি নেয়া হয়েছে, অথচ এই আন্দোলনে জান দিয়ে লড়ছে প্রায় এক লাখ মানুষ। এটার কারণ কী? প্রতিটি মানুষই যে পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের প্রভাব নিয়ে সমান মাত্রায় চিন্তিত, এমনটা আমরা যারা তাদের সাথে কথাবার্তা বলেছি, তাদের মনে হয়নি। তাহলে? আসলে একটি সমাজ বিধৌত শোষিত মানুষের সত্তায় তারা নিজেদের এক করে ফেলেছে, যে সত্তাটি বহুদিনের শোষণ ও সামাজিক-রাষ্ট্রিক লাঞ্ছনার বিপরীতে নিজের একটি শক্ত জমির খোঁজ করছে। আরাবুল, রেজ্জাকদের মতো যেসব নেতা তাদের ঘরের ছেলে ছিল, তারাই এভাবে নাড়ি কেটে হয়ে গেছে শাসকের ও শোষকের প্রতিনিধি। সেই নাড়ি ছেঁড়ার জ্বালা বা অভিমানও কি এদের আন্দোলনের অন্যতম উপাদান নয়! আমাদের মনে হয়েছে–হ্যাঁ, সেটিও একটি উপাদান।

গোটা পৃথিবীতে পুঁজি তার নিরঙ্কুশ প্রবাহের গতিপথ ঠিক করছে রাষ্ট্রকে নানাভাবে নাচিয়ে। এর মধ্যে অন্যতম হলো এই 'উন্নয়ন' চাপিয়ে দেয়ার বা পাইয়ে দেয়ার নীতি। রাষ্ট্রশক্তি কর্তৃক সাধারণ মানুষের ওপর এই জোর করে চাপিয়ে দেয়া 'উন্নয়ন' নীতি চলছে সব কালে, সব জায়গায়। স্পষ্টভাবেই রাষ্ট্র আমার-আপনার মতো সাধারণ মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন একটি সংস্থা, একটি সত্তা, একটি ব্যবস্থা। তার ধ্রুব শোষণকারী আচরণ থেকেই এটা স্পষ্ট। আর মানুষকে অধিকার প্রদানের জায়গা থেকে দেখলেও তা 'মানুষের রাষ্ট্র'–এমনটা প্রমাণ হয় না। সে হয়তো অধিকার দেয়, কিন্তু মানুষকে তার গণতান্ত্রিকতার প্রতি যে স্বতঃস্ফূর্ত স্পৃহা, তা ফুটে বের হওয়ার সুযোগ করে দেয় না। আর তার সেই ফুটে বের হতে চাওয়া আকাঙ্ক্ষাকে সংসদীয় দলগুলোও সব সময় ভোটের অঙ্কে মেপে দেখতে চায়। ফলত নিজেদের অধিকার রক্ষা এবং এই জীবনস্পৃহা খোঁজার রাস্তায় ভাঙড়ের মানুষরা সংসদীয় দলগুলোর প্রতি একপ্রকার অ্যালার্জিক। তারা একভাবে এই দলগুলো বা সংগঠনগুলোকে ওই শোষণকারী ব্যবস্থার সাথেই যেন বা এক করে দেখছে।

রাষ্ট্রব্যবস্থা পুঁজির সাথে হাত মিলিয়ে ভোগবাদিতার করাল গ্রাসে সামগ্রিক মানব সম্প্রদায়কে ঢুকিয়ে দিতে থাকে ক্রমশ। মানুষকে প্রাণ আছে অথচ জড়–এমন এক অবস্থায় সে নিয়ে যেতে চায়, যার কাছে কোনো গুরুত্ব থাকবে না তার আশপাশের পরিবেশের, ঝোপঝাড়ের, জল-হাওয়ার, নদীর, পাহাড়ের। প্রতিটি পার্থিব বস্তু ই

তার কাছে হয়ে পড়বে নানা মাত্রার ভোগের জিনিস। জীবনের স্বরূপ ধোঁয়াশা হয়ে যাবে তার কাছে। তবেই না সে হতে পারবে পুঁজিরাষ্ট্র মায়াবাস্তবতার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্রীড়নক। আর এই পথে তার কাছে সবচেয়ে বড় বাধা মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষরা। মাটি-প্রাণ-প্রকৃতি পরিবেশের সাথে পরিবেশের একটি স্বাভাবিক উপাদান হিসেবেই আচরণ করে চলা সহজ এই মানুষগুলোর স্বতন্ত্রতাই পুঁজির কাছে সবচেয়ে বড় বাধা। যে কারণে 'উন্নয়ন' নামক ঢালটিকে ব্যবহার করে সে এই মানুষগুলোর উচ্ছেদ চায়, রক্ত চায়। এই মানুষদের যাবতীয় সংস্কৃতি, যা এই মানুষদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত জান-মান বাঁচানোর লড়াইয়ের ইন্ধন জোগাতে পারে, সেই সংস্কৃতিকে রাষ্ট্র তাই টুকরো টুকরো করে ফেলতে চায় পুঁজির ওপর ভর ধরে। মাটির মানুষদের সমাজে ক্ষমতার এই যে চরমভাবে বিকেন্দ্রীভূত হয়ে থাকা, সেটা তার কাছে খুব ভয়ের। রাষ্ট্র কোনো শত্রুকেই জীবিত রাখতে দিতে চায় না। ধরিত্রীসন্তানরা কিন্তু লড়েই চলেছে। আর আমরা যারা এত কিছুর পরও বেঁচে আছি, তাদের কাজ শুধু এটুকু হতে পারে–নিজেদের মনের মধ্যে ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকা ওই মাটির সংগ্রামী সুরটিকে ধরা!

ঈশান: গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত এবং জমি জীবিকা বাস্তুতন্ত্র পরিবেশ রক্ষা কমিটি, ভাঙড়ের সাথে যুক্ত একজন আন্দোলনকারী।

ইমেইল : ishansantra@gmail.com

তথ্যসূত্র

১.http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html, টেবিল নং ২.১৪ দ্রষ্টব্য

২. দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসে বের হওয়া একটি প্রতিবেদন
http://www.nytimes.com/2013/06/14/us/department-of-energys-crusade-against-leaks-of-a-potent-greenhouse-gas-yields-results.html

৩. এই লিঙ্কগুলো দেখুন–

ক)
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.963.9302&rep=rep1&type=pdf

খ)
http://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp#elfemf

গ)
https://www.irwaonline.org/eweb/upload/web_0488_Impact_of_Powerlines.pdf

কৃতজ্ঞতা

১. নিশা বিশ্বাস
(http://www.countercurrents.org/author/nisha-biswas/)

২. জমি জীবিকা বাস্তুতন্ত্র পরিবেশ রক্ষা কমিটি, ভাঙড়

৩. বিশেষ তথ্যানুসন্ধানী টিম
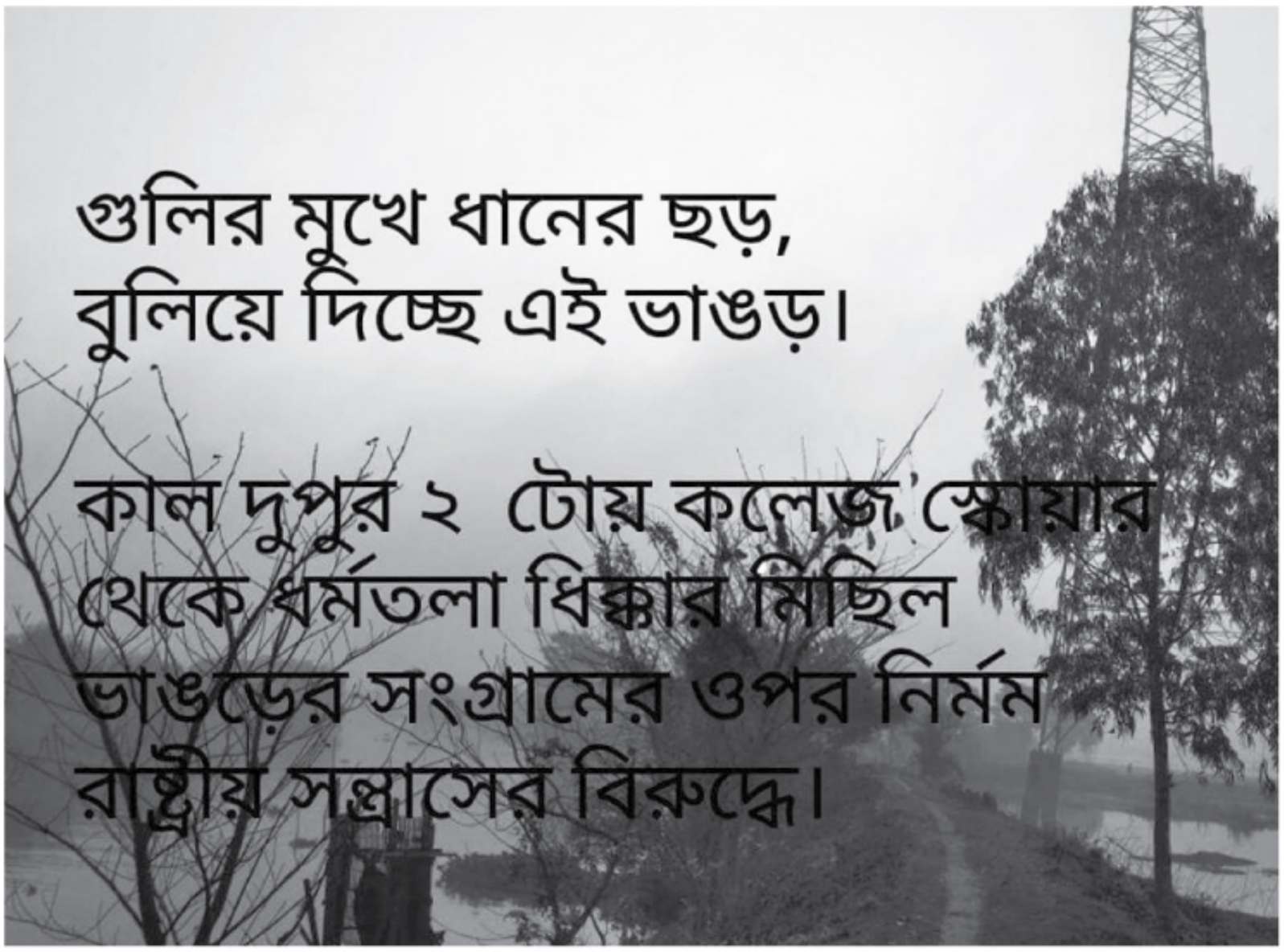
৪. ভাঙড় এলাকার সমস্ত গ্রামের গ্রামবাসীবৃন্দ